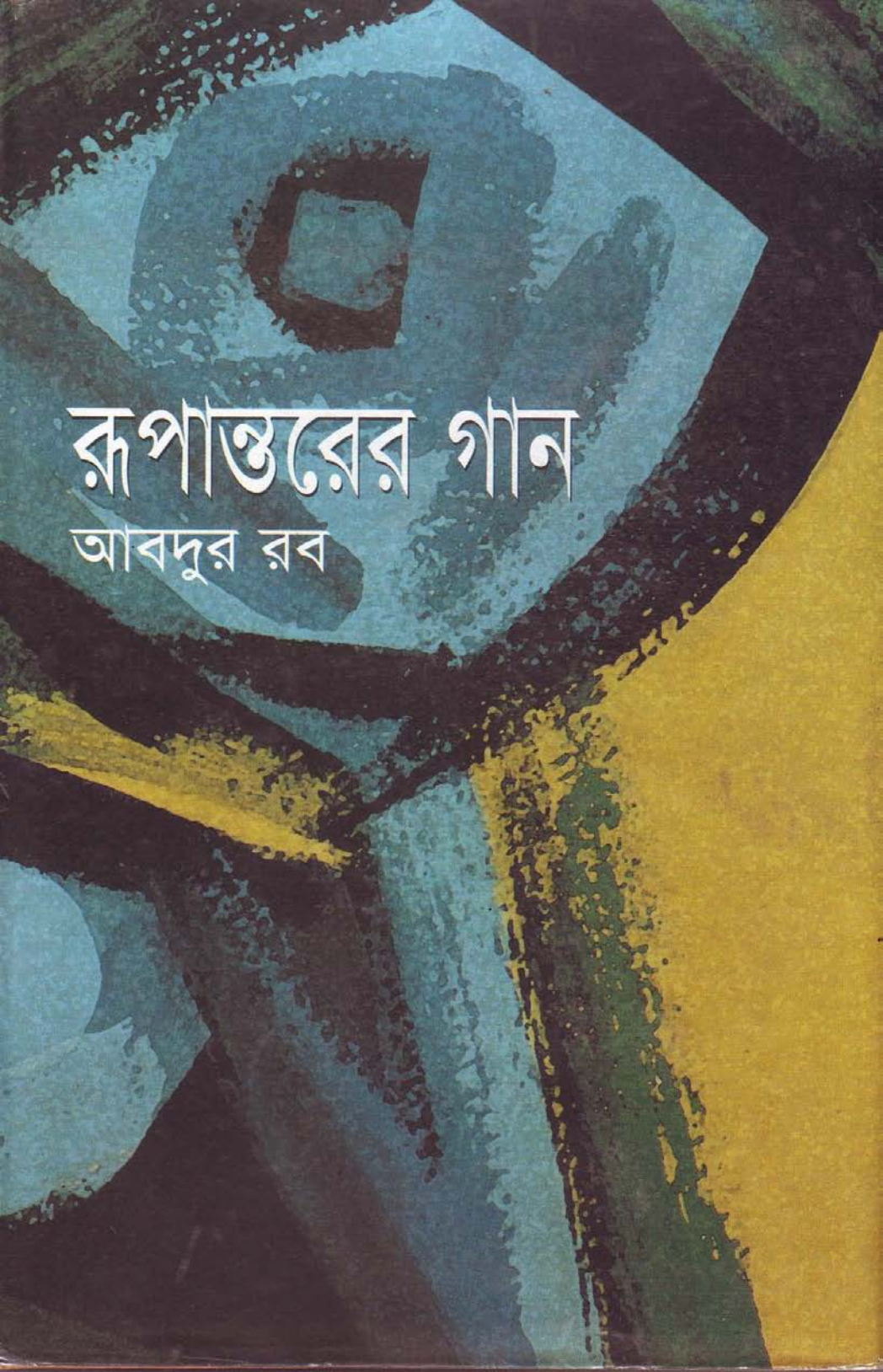

রূপান্তরের গান

আবদুর রব

রূপান্তরের গান

রূপান্তরের গান

আবদুর রব

বিদ্যা প্রকাশ

সূ চি

৯ / উত্তরসাধক
১০ / নারী অভিধান
১১ / এলিয়েন
১২ / বাল্যশিক্ষা
১৩ / পেখম প্রতিভা
১৪ / কিউরেটর
১৫ / যাত্রার জ্যামিতি
১৬ / ইশপের গল্প বলছে আততায়ী
১৭ / প্রতিবিশ্ব
১৮ / মন্ত্রবীজ
১৯ / নগর বাউল
২০ / লজ্জা
২২ / আলোমতি
২৩ / ইতিহাস
২৪ / ক্ষয়
২৫ / কাকতাড়ুয়ার দর্শন
২৬ / শামুক
২৭ / উপমনস্তত্ত্ব
২৮ / একটি গুল্মলতা
২৯ / অগ্নিযাত্রা
৩০ / মৃত নদীর উপকথা
৩১ / ত্রিতল জীবন
৩২ / ইঁদারা
৩৩ / কলস
৩৪ / স্মৃতি
৩৫ / ধূলিখেল
৩৬ / সংসার নীল জলে
৩৭ / ভাষাতত্ত্ব
রূপান্তরের গান / ৩৮
অনন্ত মাস্তুলে / ৩৯
কালান্তরে একই দৃশ্য / ৪০
বাগানের স্মৃতি / ৪১
ঢেউ / ৪২
স্পর্শ / ৪৩
সৌন্দর্য বিচার / ৪৪
পৌরাণিক বিষাদ / ৪৫
ভৌত ছায়া / ৪৬
স্টিল লাইফ / ৪৭
জানালা কাহিনী / ৪৮
প্রস্তুতি / ৪৯
নিজস্ব রাধা ও বৃন্দাবন / ৫০
আড্ডার ব্যালাড / ৫১
সবই দুর্মূল্য / ৫২
রিয়েল এস্টেট / ৫৩
স্বচ্ছতাও প্রতারক / ৫৪
মোহ ছাড়া জীবন অচল / ৫৫
কালের গহ্বর / ৫৬
শৈশব বন্দনা / ৫৭
ভয় / ৫৮
নতুন সড়ক / ৫৯
বনসাঁই / ৬০
কালো জ্যোৎস্না / ৬১
পতন / ৬২
অলীক লণ্ঠন / ৬৩
বৃষ্টি / ৬৪

উত্তরসাধক

আছে নীল জাদু, ব্লাকহোল...
তবু রয়ে গেছি
দক্ষিণের আশ্চর্য প্রতীক–
বিভূতি-চঞ্চল এক উড়ুক্কু কিশোর!
সারা দেহে সময়ের বাষ্প
ছেদহীন চেতনাপ্রবাহ;
আবেগ তেহাই মারে, ফসফরাস ভরা
নদীজল আলোক সজ্জিত!

একাধিক আত্মগোপন ও উন্মোচনে
চক্ষুতলগুলি দেখে :
আকাশের নীল প্রতিশ্রুতি–
স্ফটিক ত্বকের নিচে জলের বিস্তার!

সেই জলফাঁদে আটকে পড়া চাঁদ, তার
পরাবাস্তব এ উপস্থিতি নিয়ে
পূর্ণ হয় সব দেহকীর্তি!

সংগোপনে উত্তরসাধক–
ডেকে আনি বননির্জনতা...সুরের ভিয়েন...

নারী অভিধান

অন্তর্চেতনায় পরিণেয় নববালিকারা জানে
সত্য, অঙ্গ-অনঙ্গের দ্বন্দ্ব;
সংসার, বিলাপ, স্মৃতি– সকল আখ্যান
জরা-মৃত্যু-নিয়তিকে ঘিরে;
তাদের থাকে না কোনো স্বপ্ন-পরিধেয়;
স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝ থেকে সরে যায় ছায়া,
দেয়াল বদলে নেয় জীবন-ছত্রাক;
দেহময় জেগে ওঠে নবাঙ্কুর, অন্য এক সঙ্গম চেতনা–
যা কিছু সঙ্গীতময় তাই দিয়ে
সম্পূর্ণ মিলিত হতে চায়!

দেহকামনার এই নারী অভিধান
পাঠ না করেই
বিহ্বল ছুঁয়েছে তাকে, ছিঁড়ে জলপট্ট!

কিছুই থাকে না আর আগের মতন;
একাকীত্ব, মধ্যপ্রাণতায়
দিন যাপনের খণ্ডচিত্রগুলি মরুপ্রায়;
সারাক্ষণ বিচলিত, এভাবে কি চলে?

অনড় থেকো না, অর্থ দাও, অভিজ্ঞান;
পূর্ণ-করি নশ্বর শরীর–
শরীরের আনন্দ ভাণ্ডার!
আত্মহারা হই, দেখি
তোমার নির্জন জলঝুরি, বিকিরণ
যেন শেষ না হয় এ রোমাঞ্চের!

এলিয়েন

বয়স্ক শরীরে ঢুকে পড়া
শিশু আত্মাটিকে খুঁজে না পেয়ে লণ্ঠন হাতে
জননী আমার
পৃথিবীর মলিন সংসারে
প্রতিবেশীদের সময় কুড়ায়, খোঁজে
সন্তানের ছায়ালিপি, লুপ্ত অভিব্যক্তি।

আকাশে উল্কার মৃত্যু দৃশ্য,
চমকে ওঠে;
সে কেবলই ভাবে,
উদ্বাস্তু শিশুর কথা!

গর্ভধারণের এই এক গল্পক্রম– সারাক্ষণ
নিজেই নিজেকে দাও প্রবোধ, সাজাও কল্পকথা;
ঢেকে রাখো সন্তানের ত্রুটি–
মস্তিষ্কের নিউরন খুলে দেখো
উষ্ণ স্মৃতিকণা!

শেষে, অনিবার্য সব অভিমান ভুলে
প্রসারিত শীর্ণ দুখানি খড়ের হাত
টেনে নেয়
পৃথিবীর একটি মাত্র শিশু
হোক সে পরিণত– যুক্তিবাদী এলিয়েন!

বাল্যশিক্ষা

গোল হয়ে বসে
মৃত পশুপক্ষী নিয়ে ভাবে
কথা-চিন্তা-কথা-ছন্দে
ভাষা হেঁটে যায় গ্রামের ভিতর দিয়ে
সবুজ শিশুরা এইভাবে
পাঠ করে জগৎ সংসার।

পেখম প্রতিভা

অখুকু মেয়েটি ভাব করে খুকুমণি
তবু কেউ তাকে নির্বাসনে পাঠায় না,
বরং বাহবা দেয় সৌন্দর্যে স্বরাজ
প্রতিষ্ঠার জন্য!
সে কর্মঠ, জানে অহাঁটায় মেদ বাড়ে।

শরীরী বিদ্রূপ আর লোটা-কম্বলের
ট্যাবু পার হয়ে
এতোদূর এসেছে সে--
লুপ্ত তার ঘটিবাটিবোধ।

সে জানে, পেখম প্রতিভার তলে
চাপা পড়ে যায়
শিশু ময়ূরের কথা!

কিউরেটর

জানি না, কোথায় গেলে পাবো আমি তারে...
প্রাণবর্ণ সহবত;

সারাক্ষণ অ্যামিবা-নারীর
নীল-মনোক্রম কষ্ট দেখি;
শিশু কোলে নিয়ে
আগুনের নদী পার হয় তার প্রেম;
গোধূলি সন্ধ্যায় লুপ্ত বিছানা-অতীত!

এ পৃথিবী আন্তঃনাক্ষত্রিক–
মেয়েটির কাচের শরীর,
ভেঙে পড়বে যে কোনো মুহূর্তে!

নই পতঞ্জলি,
জানি না কী করে বশীভূত করে
অস্থির চিত্তকে...!

চিড়িয়াখানার
কিউরেটর আমি
পশুদের জীবনযাপন
অভিবাসনের দৃশ্য দেখে কেটে যাবে
আমার কর্তব্যকাল... ।

যাত্রার জ্যামিতি

(স্মরণ : কবি আজীজুল হক)

অনন্ত আঁচলে বেঁধে কবিতার চাবি
পূর্ণ হলো পৃথিবী ভ্রমণ;
বইতে হবে না আর ব্যক্তিগত বোঝা–
বিশুদ্ধতার দায়!

একদিন তারা-উজল গ্রামের কৃষকেরা
ঠিকই দেখেছিল
তোমার মস্তকে বোধিচক্র;

ছিলে ছোট শহরের তিক্ত হেমলক পানকারী
কান্ত সক্রেটিস;
হাতের মুঠোয় ছিল কৃষ্ণচূড়া,
অস্তিত্বচেতনা।

সূর্য দেখতে, ঝিনুক মুহূর্তে–
শব্দ আর ধ্বনি দিয়ে গড়া
নীল আকাশের বিপরীতে;
তুমি, শব্দ ও ধ্বনির সেই ছোঁয়াছুঁয়ি
আজও দৃশ্যমান!

এখন সর্বত্র পড়ে আছে 'ঘুম ও সোনালি ঈগল'
আর তুমি মুক্ত–
আয়ুর কয়েদখানা থেকে;
যাচ্ছো বংশধারা পার হয়ে
দূর ভবিষ্যতে...

ইশপের গল্প বলছে আততায়ী

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে
খুন হতে হতে দেখি :
ইশপের গল্প বলছে আততায়ী;
তার গল্প থেকে
মৃত্যুবর্তী সময়টুকুতে
জীবন, যন্ত্রণা আর সকল প্রার্থনা একাকার!

অভিজ্ঞান পূর্ণ হয় অন্তিম মুহূর্তে;
প্রতিটি সংকট বিন্দু কিছুটা সময় নেয়
ব্যূহ রচনায়...
আর আমি উল্টে চিৎ হয়ে পড়ে থাকি
কচ্ছপ-প্রতিম!

ঘড়ি বন্ধু, আবার শত্রুও
মাঝে মাঝে কাঁটা বন্ধ করে
সময়কে ছেড়ে দেয় অসময়ের হাতে;
ইতিমধ্যে আমরাও কতো
ক্ষুদ্র ও মহৎ স্বপ্ন দেখি!

এইভাবে একাধিক মৃত্যু অতিক্রম করে দেখি :
কচ্ছপের মতো উঠে হেঁটে যাচ্ছে
উল্টে পড়ে থাকা
ইতিহাস।

প্রতিবিশ্ব

শব্দ এক ভয়ঙ্কর প্রতিবেশ
উচ্চারিত হতে না হতেই
দ্রবীভূত, মিশে যায় জীবনকণায়
গড়ে প্রতিবিশ্ব!

যা তুমি জেনেছো
জীবনের পরতে পরতে
পরখ করে তা
মহাজাগতিক লিটমাস!

স্বপ্ন দেখো, পাঠকক্ষ জুড়ে জলাভূমি;
সঞ্চিত পুস্তকগুলি সন্ধ্যার বলাকা–
অন্য প্রাণ, উড়ে যায় শূন্যে...
সংখ্যাহীনতায়...।

তুমি আছো, তোমার প্রতিটি
নড়াচড়া ধরা আছে
অদৃশ্য ফুটেজে!

গ্রীষ্মদৃশ্যে পাকা কুমড়োর রং ধরে
তেমার অস্তিত্ব–
শব্দের পবিত্র সমাধিতে!

মন্ত্রবীজ

খড়িমাটির রেনেসাঁ মেয়েটি নিজেই
যুক্তি, অঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয়;
নিউরটিক; উড়ে চলে তুলাবীজ–
স্বপ্নমানচিত্রে;
উড়তে উড়তে উত্তপ্ত সে
সময় সম্ভোগে লিপ্ত হয়, ত্রিমাত্রিক;
শরীরের পরশ পাথরে
জ্বলে ওঠে সফল শুক্রাণু–
নিষিক্ত নক্ষত্র!

তার কোনো নদী নেই, আছে
দূরের কল্লোল–
অদৃশ্য জলের অভিপ্রায়;
বৃক্ষ নেই, আছে
শূন্যের উদ্যান–
দেহ গীত হয় সেই অলীক বাগানে!

রচনার আগেই রচিত
তন্তুময় এই রূপকথা
স্বতঃবর্তমান;
ফ্রয়েডীয়, নাবিককে টানে
বন্দরের দিকে!

উঠে আসে সংগ্রাম ও সম্ভোগ
যমজ দু'টি সত্য-অধিবৃত্ত;
সুতপ্ত মেয়েটি
সময়ের বীজ...
উপপরমাণু...

নগর বাউল

তরল পারদে ভাসে হাওর দ্বীপের
একখানি গ্রাম।
কালো কালো কোসা নৌকাগুলি
বিন্দু বিন্দু জীবনের সমাহার।

গোটা দৃশ্যটাকে ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায়
সারস হৃদয়;
অতঃপর নগর-বাউল
নিজেকে লুকায়
ঘন কালো চুলের জঙ্গলে।

অশ্বত্থের ডালে নয়, নিজের অজান্তে
আটকা পড়ে অস্থিরতা জালে।

বিজড়িত স্মৃতিপুঞ্জ জীবনকে দেয়
সজীবতা, তবু
এ কেমন তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা জলে?

লজ্জা

১.
এসব ভূমির পরিমাপ,
জ্যামিতিক ক্ষুধা;
হলুদ পায়ের তালে তালে
চোখগুলি ওঠানামা করে
খেয়ে ফেলে তাল-লয়-ছন্দ।

অপূর্ণ এসব নষ্ট তারার আগুনে পোড়ে
নৃত্যকুমারীর
সোনালি আপেল;
পূর্বতন সবাই দেখেছে
এইসব নৃত্যপায়ী চোখ,
সমকালে সেও দেখলো;
শতাব্দীর দুঃখ-ক্রোধ– তার ভিতরের
সর্পশিশু ফণা তোলে;
মায়াবী আলোর নিচে অলৌকিক নৃত্যছন্দে
কথাগুলি পৌঁছে যায়
ইন্দ্রের সভায়...

২.
সুরূপাকে দেখে বলি :
দেখাও তোমার বিল্ব-ছন্দ; দেখি কেমন নিপুণ পদ্য ফোটে।
হেসে সরে গিয়ে বললো সে :
দাও যুক্তি তবে তো মতৈক্য;
বয়প্রাপ্ত হও, যখন তখন
এসব শরীরী বাকছাল ভালো নয়।
: বটেই তো, শিষ্যাকে চর্চায় তাগাদা দিলে এতো দোষ!

: বলিনি কখনো অপরিবর্তনীয় নয় এই মত
তবে শর্তাধীন;
তাছাড়া প্রশ্নেরও আছে উত্তর আকাঙ্ক্ষা
তোমরা পুরুষ জাতি দ্রুত
কলা ত্যাগ করো, সূক্ষ্মতা সাধনে বড়ই বিমুখ!

আলোমতি

তুমি সেই আলোমতি দেখে মনে হয়
অন্নপূর্ণা রেঞ্জ থেকে দেখা সূর্যোদয় ॥

তুমি হাঁটো থর থর কাঁপে হিমালয়
ভেঙে খান খান হয় সংযম আলয় ॥

তুমি হাসো, ঝড় ওঠে– বুকে জাগে তৃষ্ণা
করি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরি ভাবি না, বিষ না ॥

তুমি কাঁদো বন্যা নামে মনসমতলে
-ত্রাণ ভিক্ষা করি যেন লুকাও আঁচলে ॥

রোদ ওঠে, দেখি তুমি ছড়াও উত্তাপ
ভাবি এর অর্থ হলো তীব্র নিম্নচাপ ॥

তুমি এতো কিছু তবু অন্তিমে কিছু না
ভোগবিন্দু থেকে আমি করেছি সূচনা ॥

ইতিহাস

তুমি সেই কৃষকের রাজহাঁস। লোভে
অযথা তোমার পেট চিরে কিছুই পাবে না।
তার চেয়ে ঝিলিমিলি সরোবরে তোমার সাঁতার,
জল খুঁড়ে গুগ্‌লি তোলা দৃশ্যের ভিতরে
স্বাপ্নিক কৃষক পাবে স্বর্ণডিম।
তখন সকল উৎস-অনুসন্ধিৎসা প্রেমিক-প্রেমিকা
প্রতিভার হাত ধরে হেঁটে যাবে ক্যানেলের ধারে।
চারিদিকে চিন্তা, বিবেক-বুদ্ধির ক্ষুধা
জ্বলে উঠবে দাউ দাউ।
উস্‌কে ওঠা ক্ষুধা নিয়ে ওদেরকে আসতেই হবে
আমার এ রুটির দোকানে।

ক্ষয়

কাউকে বলে না, তার স্বপ্নসাধ ভেঙে দেয়
সংসারের ক্ষয়। দুর্বোধ্য সমস্যাগুলি
দেখে মনোযোগ দিয়ে আর একা একা
খেলা করে সারা ঘরময়। অনুতাপে
আমি তার করুণ মুখের দিকে তাকাতে পারি না।

হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠে বনভূমি, গৃহকোণ;
ভয়ে গ্রাস ফেলে সে তখন ছোটে দিগ্বিদিক।
শিশু নিগ্রহের এমন মহান প্রাকৃতিক পরিবেশ
তার কচি কলজেটাকে ছিঁড়ে খায়।

খেলনা ভাঙে, ভাঙে নিজের পৃথিবী,
ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত তবু নিরপেক্ষ– বেলুন ওড়ায়;
স্বপ্ন দিয়ে ভরা তার প্রাণের বেলুন।

কাকতাড়ুয়ার দর্শন

ভূমি আর ফসলের পাহারায় আছো
লাঠির মাথায় তুমি ষাঁড়ের করোটি;
তোমার ভিতরে জ্বলে ঋগ্বেদের অগ্নি
তুমি পরিণতি আর স্বপ্ন উপাসনা।
প্রাণ থেকে প্রাণহীন বস্তু হয়ে হাসো;
সৃষ্টির এমন ছন্দে নেই কোনো ত্রুটি।
অসীমের মধ্যে আছে প্রকৃতির লগ্নি,
কিসে তাৎপর্যময় তোমার সূচনা?
নিগূঢ় অনেক কথা নিজে বলে দিলে
বাকিটা আমার মুখে শুনতে চাও জানি।
শোন তবে মাঠ থেকে দু-একটি কথা :
সর্বদা বিনিদ্র থাকি ফসল মঞ্জিলে;
আমার উপমা আমি, নয় দেহখানি,
ঝুলে থাকা জীবনের এই সার্থকতা!

শামুক

শামুক স্বাপ্নিক প্রাণী, জানে কী করে
স্বপ্নকে নিরাপত্তা দিতে হয়। তার মতো
আমাদের কোনো শক্ত আবরণ নেই। তাই
স্বপ্নকে সুরক্ষা করতে পারি না, কখনো।
গন্ধম ফলের পাপ নিয়ে থাকি ভ্রমলোকে;
ইটের অসুখে ম্লান– পতিত গ্রহের অনুগত।
এতো কিছু আবিষ্কৃত হলো তবু সিলিকন-প্রাণ
পড়ে আছে সংকীর্ণ কোটরে...।

প্রতিপাদ্য জীবনযাপন এতো জল্পনা-কল্পনা
সব বিগত যৌবন। ঝড়ের পাখির মতো উড়ি
জন্ম থেকে মৃত্যু, তবু ছুঁতেও পারি না
স্বপ্নভূমি, মহালোক। বিপরীতে,
তোমার শম্বুক গতি; ধ্যান আর জ্ঞানে জীবনের
পরম সংশয় সরে যায়
কোনো এক নবতর নক্ষত্রসন্ধানে।

স্বপ্নবিন্দু নয়, আমরা তো ক্যাকটাস ভালোবাসি
বেদেনীর মন্ত্রমঞ্জুষায় ভুলে থাকি।
ক্ষীণকটি নারীর অধরে
অস্ত যায় আমাদের সকল অর্জন

উপমনস্তত্ত্ব

ঘোড়ার শরীর দেখে শিহরণ জাগে,
কুচকাওয়াজ করে ওঠে
অবদমিতের বিলাপ-বাসনা
শঙ্কিত পোশাক পরিচ্ছদ
ছিটকে পড়ে এদিক-সেদিকে
ঘরময় খুরের আওয়াজ।

ঘামে ভেজা ঘোড়ার শরীর
যখন জানালা টপকে চলে যায় ধমনী কাঁপিয়ে
পানি পিপাসায় ঘুম ভেঙে যায়।
মনে মনে আওড়াতে থাকে স্বপ্নের সংলাপ,
একই স্বপ্ন বারবার!

কখনো কখনো ভয় হয়
যদি সব জেনে যায়!
ঘর-গেরস্থালির ফাঁকে ফাঁকে
উটপাখি ডুবে যায় স্বপ্নের মর্মরে।

যা হওয়া উচিত তা কেন যে স্বপ্ন হয়!
নিজের মনকে ঠোকরাতে থাকে নারী
নিজের মনকে...।

একটি গুল্মলতা

পাথরের কোল বেয়ে কবিতা শ্রেণীর
একটি গুল্মলতা
জন্ম শাসনের ফাঁক দিয়ে
বেড়ে উঠলো,
পাতায় পাতায় তার মৃত্যু ফোঁটা;
এক উদাসীন স্বরের রাখাল
বেদুইন ইচ্ছা অনুসারে,
দিনে সূর্যালোক দেখে রাতে শীত;
অন্ধকারে তাঁবু হয়ে টানটান
পাহারা বসায় ভিতরের ঘুম
যথাস্থান থেকে বস্ত্রচ্যুতি কিংবা
গোঙানির শব্দ।
শিশিরের অভিযাত্রা শেষ হলো
তার পাতার ওপরে এসে
আর তক্ষুণি সকাল
প্রমিথিউসের ভাই মাতরিশ্বা
নিজেকে কবিতা বলে চিৎকার করে উঠলো
অভিজ্ঞতা স্তরে।

অগ্নিযাত্রা

জন্মচিতা জ্বেলে দেয় অগ্নিযাত্রা;
ঘুড়ি বালকেরা ভেবেছিল, আকাশ সাঁতার
সন্ধ্যা হলে দু হাতে গুটিয়ে নেবে
তন্তুর দূরত্ব।

উড্ডয়নের এক একটি সার্থকতা
সময় বিন্দুকে স্পর্শ করলে,
মনে হয় পরিত্রাণহীন– ব্ল্যাক হোল,
ঢুকলেই চিড়িয়াখানার গন্ধ,
কোনো ফিরতি পথ নেই!

লক্ষ্যভ্রষ্ট পুড়ছো তুমি,
তোমার পায়ের নিচে নড়ে উঠছে
মৃতভাষা–
ফুরিয়ে যাওয়া কোনো এক
জীবন-কাহিনী ঘিরে!

মৃত নদীর উপকথা

মৃতপুত্রকের মন ব্যথায় টন্‌টন্‌, তবু
নদীটির নামে উঠবে না প্রবল ঢেউ;
খুঁড়তে গিয়ে দেখবে শুধু মাটি।
কাঁকড়ার কঙ্কাল ধীরলয়ে
হেঁটে যাবে বিস্ময় ছড়িয়ে

বাতাসের শব্দে হয়তো বা শুনতে পাবে
ইঞ্জিন নৌকার কাঁপা কাঁপা স্বর।

মাঠের ভিতর ফাঁকা বাড়িটায়
রাতভর কাশতো এক বুড়ো,
এখন সেখানে হরেক রকম ঘরবাড়ি।

জানালায় সাদা-লেস পর্দা ঝোলে
বর্তমান বাসিন্দারা জানে না, কখন
বাগানে খোলস ছেড়ে চলে গেছে সাপ।

ত্রিতল জীবন

টিনের চালের নিচে শীতাতপ চাটাই বিছানো :
এই পাটাতনখানি সংসার সংবেদ।
কেউ তার শরীর দেখেনি; কেবল শুনেছে
ব্যস্ততম গৃহিণীর হাঁটাচলা–
নিয়তির রান্নাঘরে...।

কেউ বলে শত্রু, পুরনো প্রেমিক–
যে যাই বলুক,
জীবন-লোলুপ প্যাঁচা আসে, এসে বসে
জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন গৃহটির প্রান্ত ছুঁয়ে।

সারা রাত ডানা ঝাপটায়
অখণ্ড ধারালো স্বরে ডাকে
শেষে গলা চিরে হিস হিস শব্দ হয়
ইঁদুরীকে ডেকে ডেকে।
নিচে,
তক্তপোষে শুয়ে মানুষ নির্ণয় করে :
জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন গৃহটির বৈশিষ্ট্য এমন
একই সূত্রে বেঁধেছে সে ত্রিতল জীবন।

ইঁদারা

জলজ সম্পর্কে বাধা পড়ে ইঁদারাটি থেকে গেল।
জল ছিল তার বুকে, জল ছিল তার ঘরে
তবু জল ছিল না তো কোনোখানে!
কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না, যেমন পারেনি উদ্দালোক।

সেই কবে জলবৃন্তে ফুটেছিল চাঁদ সেসব কুহক আজ
ঝরা পাতা পুরাতন ছায়া তরল মৃত্যুর ফাঁদ।
কপিকল ওঠানামা করে, ঝুঁকে পড়ে জল মাপে কঙ্কাবতী।
প্রহরে প্রহরে কতো হাস্য কোলাহল, লীলায়িত ছন্দ
তথাপি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বিবিধ জঞ্জালে।

জল সরে যায় নতুন জলের উৎস বরাবর
এই ভালো, পাতালের দিকে তাকাতে হয় না আর।

কলস

সযত্নে যে কলস তোমার কাঁখে ওঠে
আমি তার ধর্মসহদর,
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে খুব হাসি পায়,
তবে আমি ভুলেও হাসি না।
যখন তোমার কাঁখে চড়ে
দোল খেতে খেতে যেতে পারি
তৃষ্ণার্ত পথিক
তখন আমার হাসির কি দরকার?
এ তোমার নিজস্ব সৌন্দর্য,
নিখুঁত দূরত্বে কাঁপা কাঁপা উজ্জ্বলতা–
আমি কে ফুঁ দিয়ে নেভাই সে মোমশিখা?

তোমার শরীরে
জলের বাঁশিতে কে মোহিত,
কলস না কৃষ্ণ?
ভাই রাধা, যমুনা কোথায়
আর তুমি চলেছো কোথায়?

স্মৃতি

বন্ধন ছেঁড়ার আগে
একটি মিশ্র রাত আমি কাটিয়ে এসেছি
তোমার শরীরে–
নতুন ধুলায় লিখে রাখি এ বসন্ত;
নতুন তুলিতে ছুঁয়ে দিই সকল রঙের তুঙ্গ;
শব্দ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।
এক চাঁদ দু বার ওঠে না, এক বৃষ্টি...

বহুবচনের বালিকা জানে না
ভাঙা প্রতিশ্রুতি পড়ে আছে মুহূর্ত বিন্দুতে।

এমন শহর তুমি
যেখানে কখনো আর যাওয়া হবে না।
অথচ শিশির ভেজা ঘাসে
দেখবো নিজের আঁকাবাঁকা পদচ্ছাপ!
দীর্ঘ জীবনের উপকূলে
তুমি হবে এমন সতর্ক ধ্বনি, আমি যার
কিছুই বুঝি না!

ধূলিখেল

ভিতরে যে নদী বাস করে, বাঁক নেয়–
ভাঙা সিঁড়ি রেখে যায় যৌবনে, শরীরে;
জীবন সন্ধানে জন্মে, প্রতিজন্মে সেই
পুঞ্জীভূত শব্দহীন শুষ্ক বালি আত্মা
ভেদ করে যেতে চায় রূপ সনাতন।
বারবার ক্রান্তিকাল এসে সামনে দাঁড়ায়;
প্রাচীর কঠিন;
উদ্ধার অসাধ্য জেনে, ধূলিখেল ছেড়ে,
শ্রমণ গৌতম হয়তো বা কবিরাও
'যা সাধ্য তা করেছি হে আনন্দ' বলে
উঠে পড়ে জীবনের উল্টোরথে।
পথের পিপাসা এ রকমই– মনুষ্য হৃদয়ে
রেশমী ফাটল;
রক্ত আর স্বপ্ন নিয়ে তারা ছুটতে থাকে
এক একটি মাৎস্যন্যায় অরাজক নগরী ছড়িয়ে
নবতর কোনো গোত্রসম্ভবের দিকে...।

সংসার নীল জলে

নীল পুরুষের লোভে নীল রমণীরা
সংসার পতাকা হাতে গোত্রত্যাগ করে;
আত্মীয় অরণ্য থেকে নেমে আসে কঠিন শিলায়।
ইন্ডিগো স্বভাব সেই সব নারী বেণী ডগায় বেঁধেছে নীল ফিতা;
ওদের বিবাহ চিহ্ন পাথরের নাকফুল, যেন
দুঃসাহসী নাবিকের সাগর কম্পাস।

ভাবলো তারা সাঁতার পোশাক পরে নেমে যাবে
সংসার নীল জলে– নীল অবগাহনের এই তো সময়!
সময় নিজেও এক নীলকণ্ঠ, জানে পুরুষ কখনো নীল হয় না;
আর অনন্ত এ কালোস্রোতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে দেখবে তারা
নির্জন ঝিলের জলে ভাসছে জলমোরগের ডানা!

ভাষাতত্ত্ব

[সব শিশু কাজ করে স্বপ্নের খনিতে
ভাষা পাল্টে যায় স্বপ্নে– শিশু জবানিতে]

ঋতুভেদে ভিন্ন সব আলোছায়া– আবহাওয়াবোধ;
চারিদিকে শব্দরথ, স্বপ্ন আর
আদর্শ-বিতান;
লিপিহীন কাল থেকে ভাষার আলোতে
প্রতিফলিত এসব দৃশ্যপট রহস্য ছড়ায়;
সোজা হও, জলাভূমি জুড়ে
যে জীবন ছিল তোমার খসড়া, তার
স্তোত্রপাঠ, কিংবদন্তি– স্তুতিগান ধরে হাঁটতে থাকো,
দেখবে, নগ্ন-তিক্ত-শ্লেষে ভরা, চাষাভুষো
আঞ্চলিক কথাগুলো পাল্টে দেয়
বিশুদ্ধ বয়ান!
এও এক আরোগ্য প্রক্রিয়া–
রক্তদান কর্মসূচি :
বৈসাদৃশ্য পান করে
সেরে ওঠো সবার অলক্ষ্যে;
সময়ের পরতে পরতে
শিলীভূত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন...
খুঁড়ে দেখো, শব্দময় শিশুরা তোমাকে
শিখিয়েছে ক্রীড়াধর্ম– কি করে খেলতে হয়
বৃক্ষলতাপাতা পশুপাখিদের সাথে;
হাসতে জানো না তুমি, হেসে খেলে ওরাই তোমাকে
পার করে দেয় ভবনদী–
ওরা শেখে আর পাল্টে দেয়
তোমার নিয়তি!

রূপান্তরের গান

নির্জনতা থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া জন্মলাভ করে
কুণ্ডলি পাকায়, উসখুস করে–
সজ্ঞানে এড়িয়ে চলে ভিড়।
আতশী কাচের শক্তিদৃষ্টি ধরতে পারে
এই খেলা– রূপান্তর গান।
জল পড়ে পাতা নড়ে– শরীর ছাপিয়ে
মূর্ত হয় ধ্বনি;
সেই গানে ঘুম আসে ঘুম যায় ভেঙে–
নির্বাণ লাভের শিখা হয় প্রজ্বলিত;
বহু চিহ্ন দিয়ে আঁকা দ্বন্দ্বের কাহিনী জমা হয়
আপাত চৈতন্যে!

মর্মভেদী নির্জনতা বুকে নিয়ে
চালক-আসনে বসে সেও;
টানেলের অন্ধকারে
বুক চিরে
হৃৎপিণ্ড-মশাল জ্বালায়–
আত্মপরতায় মানুষ তা ভুলে যায়
কেবলই মাড়ায় সে হৃদয়...।

অনন্ত মাস্তুলে

সেই যে পাখিটা একদিন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে
বসেছিল জাহাজ মাস্তুলে–
বারবার উড়ে দেখেছিল
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, সে আর কেউ নয়
তোমারই চৈতন্য;
তুমি তাকে বলেছিলে যাও, দেখ
পাও নাকি তীরের সন্ধান!
তীর হলো সময়-বিছানা–
মুক্তির সূচনা ও সমাপ্তি!
এখান থেকেই শুরু হয়
অন্য সূত্র অন্য এক গান;
যাকে ঢেউ বলি আমরা, তা ঠিক ঢেউ নয়,
অথই প্রাণের আলোড়ন...
তুমি তাকে ভুলে গিয়ে
কোন্ দুঃখে বসেছিলে চৈতন্য হারিয়ে?

তুমি কি এখনো সূত্র ভুলে
বসে আছো
অনন্ত মাস্তুলে?

কালান্তরে একই দৃশ্য

মানুষ নির্মিত হতে হতে ভেঙে যায়
অগ্রসর হয় প্রতিদ্বন্দ্বী;
সজাগ থেকেও লাভ নেই–
ক্লান্তি আর উদাসীনতায় দেখবে :
কৃতকর্মগুলি বিপ্রতীপ, ঘুরে দাঁড়িয়েছে;
সারাক্ষণ ছায়া নড়েচড়ে;
তুমি এক আঁধার, আরেক আঁধারের দিকে ধাবমান!

সংসারও বদলে নেয় কুলা;
ভাঙা ফুলদানি, সংযোজন বৃথা;
ব্যবহৃত ডাকটিকেটের মতো তুমিও অচল এক
জীবন স্মারক!

অস্তিত্ব? অস্থির একটা বিন্দু,
এতোকাল বেঁচে ছিল অসম্পূর্ণ–
এখন তাকেও যেতে হবে বিপরীত গর্ভগৃহে!

বাগানের স্মৃতি

অন্যদের দেখাদেখি তুমিও বাগান করেছিলে,
হৃদয় সমান।
সময়ের খড়কুটো দিয়ে
ঢেকে দিয়েছিলে বারো হাত কাঁকুড়ের
তের হাত বিচি।
কাঁকুড়ও ফলেছে ঠিকই কিন্তু তা তোমার নয়–
পচনের আগে ওরাও পেয়েছে ভয়;
বাগানের ঝুড়ি দেখে তাই
চলে গেছে নিজস্ব বাজারে;
তোমাকেও ঠকায়নি, রেখে গেছে
বাগানের স্মৃতি!

ঢেউ

ঢেউয়ের সমষ্টি মানুষ;
মানুষের দু চোখে সবুজনীল ঢেউ!

সিসা আর রুপা রং ঢেউগুলো উন্মাদনা–
জীবনের চেয়ে উঁচু!

হাওয়া ঠেলে পরিযায়ী ঢেউ আসে–
একা একা, দল বেঁধে।

মহোৎসব ছাপিয়ে ফুটে ওঠে
ঢেউয়ের লেখচিত্র : উল্লম্বে আত্মবিশ্বাস;

আনুভূমিকে আঘাত; অস্বীকার;
হতাশা, ক্ষোভ, ভয়– এই সব সন্ধিক্ষণ!

ঢেউই ত্রিকাল, স্বপ্নভেদ– সব যুদ্ধ
ছলাৎ-ছল শব্দ উপেক্ষা, অপেক্ষা!

ঢেউগুলি এক একটি অনুকল্প, প্রমাণিত হতে
একে অপরকে দেখে নেয় নিজের আরশিতে!

নিরন্তর জলভঙ্গ, জলযাত্রা–
নিপাতনে সিদ্ধ স্রোতধারা, অনূঢ়া সময়!

ঢেউয়ের মন বুঝি;
মানুষ ঢেউয়েরই চক্রব্যূহ!

স্পর্শ

মালাকাইটের ঝাঁপি খুলে গল্পটা বেরিয়ে পড়ে :
গ্রানাইট সুন্দরী জানে না
কী ঝাপট লাগে তার মনে,
কোথায় তাকিয়ে থাকে সবুজ দুচোখ!

নরম স্পর্শের লোভে দেহ চায় অলীক পালক–
রহস্যদেবতা!
অসম্ভব তৃষ্ণা তার সোনালি গলায়–
অচেনা এ সম্মোহন;
ডেকে নেয়, চিৎ করে শুইয়ে দেয়,
নয়ানজুলিতে–
যৌবনের গাঢ় নরম ঘাসের বুকে!

প্রতিটি স্পর্শের লিপিচিহ্ন রয়ে যায় :
প্রেমদীপ জ্বেলে
পুরুষ অপেক্ষা করে, নাকি
ব্যাঘ্রাদির ন্যায় শিকার পাহারা দেয়
স্পর্শমাত্র তা সুস্পষ্ট হয়!

স্পর্শে মৃত্যু, পুনর্জন্ম–
স্পর্শগুলি বুড়ি চুঃ ছুঁয়েই
ছুটে যায়, সাদা-কালো চিন্তার আড়ালে!

সৌন্দর্য বিচার

এইসব জৈবদিন কামরৌদ্র পোড়াবে তোমাকে;
মুহূর্তেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে
বহু পৃষ্ঠা প্রামাণ্য দলিল!

সর্বদা এ-এক প্রহসন;
সংশয় কাটে না তবু বলতে হবে সুগন্ধি কবিতা–
বাকিটুকু ঈশ্বরের কৃপা!

কোথাও সৌন্দর্য দেখলে সাবধান!
বুঝবে আশপাশেই রয়েছে
ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার; ওরা
পাহারা না দিলে
সৌন্দর্য বাঁচে না :

সমুদ্র যোনিতে আছে
উঁচু উঁচু ঘাস-সাপের আবাস...
সেই ঘাস আর সর্পভূমে মৎস্য রং ধনু ওঠে;
জলপ্রজাপতি, সমুদ্র ময়ূরী খেলা করে, ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র!

সর্বদা এ-এক তীব্র বিষমাখা তীর,
তা না হলে কেনই বা এতো লোক প্রাণ দেয়
সৌন্দর্যের হাতে!

পৌরাণিক বিষাদ

পৃথিবীতে কতো বার রুপালি হাঁসেরা এসে
হেমন্তের সরোবরে গেছে ভেসে?
অরুন্ধতী রাতে
নক্ষত্রের জলে ভেজা হাতে
কে নিয়েছে টেনে
দৃষ্টিবাণ হেনে?
কে গিয়েছে লুব্ধ, প্রণয় আঁচল ধরে
বিনন্দিত নারীটির ঘরে?

কুশল কথন শেষে মালিনী হৃদয়
দিয়েছে অভয়, এই অজুহাতে
পাঞ্চজন্য শঙ্খ হাতে
বাজিয়ে বাজিয়ে স্থির হলে!

আজও লোকে বলে
তারপর সব অন্ধকার
গোলাপি উরুতে জন্মান্তর, হাহাকার...

ভৌত ছায়া

তাপস্নান শেষে উঠে এলে
নগ্ন, পরিব্যক্ত;
নিবেদনস্তূপ কোথায়? পতঙ্গপুরে
ছায়ার পাতায় বসে লেখো ছায়াশব্দ
দৃষ্টিমিথস্ক্রিয়া;
পাল্টে যায় ধূলিভাষ্য, বস্তু;
পসরা সাজাও/দার্শনিক খরিদ্দার–
নিজ হাটে নিজেকেই করো কেনাবেচা!

তারার বুদ্বুদ তুমি; ফেনা, ফেনায়িত;
কুদৃষ্টিসম্পন্নদের চোখ
খুলে গেঁথে গেছে
তোমার শরীরে;
অর্ধেক মানবী তুমি বাকিটা জোনাকি,
তোমার খাদ্য তো
পাতার আঁধার!

চোখগুলি কাঁপে– দিশেহারা প্রজাপতি,
শূন্যতার মাঝে খুঁজে ফেরে
নিজের ঠিকানা;
বিশুদ্ধ যন্ত্র সে– নিজে নিজেকে চালায়–
তুমি এই কণাবাদী প্রজাপতিটির ভৌত ছায়া...

স্টিল লাইফ

জলে পড়া পাতাটি প্রক্রিয়া;
সবুজ উধাও...
পড়ে আছে শুধু জাল, অস্তিত্ব, কল্পনা...!

জানালা কাহিনী

জানালাটি বন্ধ, তবু অভ্যাসবশত
তাকাই সে দিকে!
দেখি ঠিকই দাঁড়িয়ে রয়েছো
কালো জামা পরে;
হয়তোবা সরে গেছো মুহূর্ত কয়েক,
আবার আসবে,
আমাদের জানালাজীবন
স্বাভাবিক করতে!

সময়ের পর্দা তুলে ফাঁকে
অন্য এক বাড়ি এসে জুড়ে দেয় উত্তরাধুনিক
জানালা কাহিনী!

প্রস্তুতি

প্রজাতি শাসিত ফুল রঙের পুতুল;
রূপ উচ্চারণে
ভেবে নেয় কিভাবে ফুটবে সে
সৌন্দর্যের দরবারে–
মিশ্র নাকি একপেশে রঙে?

একা একা ঘর গোছাচ্ছো, গোছাও, শুধু
মনে রেখো ঘরের ভিতরে
বস্তুবাসিন্দারা ছিল, থাকবে; তাদের ছুঁতে হবে
স্বপ্নের কোমল স্পর্শে
ঠিক করে নিতে হবে কোন গানখানি গাবে তুমি
গুন গুন করে...

নিজস্ব রাধা ও বৃন্দাবন

আমি নোনামাছ খেয়ে চরের কাদায়
হেঁটে হেঁটে বেড়েছি সেখানে;
সে তোমাকে বুক খুলে দেখিয়েছে নোনামাংস
বালি-হৃদয়ের উর্বরতা!

সে তোমার পূর্বতন প্রেম;
ইভ ও নয় আদমের প্রথম সঙ্গিনী–
তারও ছিল প্রেমিকা– লিলিথ;
এখনো প্রতিটি চন্দ্রাহত যুগলের
মিলন মুহূর্তে
এ অভিচারিণী
শরীর তরঙ্গে
সৃষ্টি করে সূক্ষ্ম ব্যবধান;
মানুষ কখনো তাই ছুঁতেও পারে না
শরীর রহস্য;
অর্থময়/অর্থহীন জীবন এভাবে
মাটিতলে প্রবাহিত নদী
খোঁড়ে, বয়ে চলে... ।

পৃথিবীতে সকল কৃষ্ণেরই আছে
নিজস্ব রাধা ও বৃন্দাবন–
মিলন অতৃপ্ত জীবন তো নয় তবু ব্যক্তিগত;
এও এক সৌরঝড়, প্রকৃতির চিত্ত উদ্বেলতা–
এখান থেকেই শুরু হয় জিতবন...প্রসাধন...
প্রাত্যহিক কর্মঘণ্টা.... ।

আড্ডার ব্যালাড

আড্ডার আরকে ডুবে
যে ভাবে সুখের কথা বলো
শুনে মনে হয় তুমিই সুখ
তোমার প্রতিটি অভিব্যক্তি
কেমন বলয় সৃষ্টি করে!

সময় শিরায় টান লাগে, শুরু হয়
যে যার রাস্তায় ফেরা;
কেউ তো জানে না
নিরুদ্দেশ হয়ে
কে কোন রাস্তায় উঠেছিল শেষাবধি!

সুলভ সন্ধ্যায়
এই সব আড্ডার মৌমাছি
ওড়াউড়ি করে;
আবার হঠাৎ চাক ফেলে উড়ে যায়,
হারায় মধুর...!

সবই দুর্মূল্য

লোকে ভুলে গেছে
সরুজু তীরের পুষ্প মেলা;
আগত নবীনা কন্যাস্তবকের মধ্য থেকে
ঋতুমতি গার্ন্ধব্য চয়ন!

রিয়েল এস্টেট

যে নামেই ডাকো
এই মায়াকাননের জন্য
সবাই উন্মুখ,
চেনা ঠোঁট চুমু খায়
অচেনা ঠোঁটে।

এ এক চমৎকার লোহার দোকান
মানুষ এখানে চকচকে স্টেনলেস
সকল সমস্যা মোড়ে তারা
নিয়ম নিকেলে!

কালের গহ্বর

কিছু জল কাটতে কাটতে বাকিটা আকাশ
এ রকমই জলের প্রকাশ
জলের সংসার হলে মাটির হৃদয়
হৃষ্টচিত্তে শুষে নেয় সব জলকষ্ট।

তৃষ্ণা ছাড়া কে রচিতে পারে প্রাণের প্রস্তাব?

ঘরে ঘরে ঝুড়িবার্তা পৌঁছে দাও
মানুষ আসুক পিপীলিকা–
কেটে যাক কালের গহ্বর!

শৈশব বন্দনা

আমার ভিতরে আছে তোমার কম্পাস
তাই দিক নির্ণয়ের নেই কোনো চেষ্টা;
জানি তুমি একদিন টেনে ধরবে রাশ;
তোমার ইচ্ছাই হবে আমার প্রচেষ্টা।

আমার ভিতরে আছে তোমার বন্দনা;
অন্য কোনো প্রশস্তির নেই প্রয়োজন;
জানি হৃদয়ের ধন বড় হাতে গোনা–
মানুষের সব ইচ্ছা হয় না পূরণ!

তোমার সমুদ্রে ভাসে আমার জাহাজ
আমি তাই জীবনের কিনারা খুঁজি না;
সবাই হয়তো ভাবে আহা কি দরাজ
যে যাই বলুক আমি কিছুই শুনি না!

আমার সঞ্চয় শুধু সোঁদাগন্ধী তুমি
হারাতে চাই না আমি এইটুকু ভূমি!

ভয়

১.
সব রূপ-রস-গন্ধ শুষে নেয়,
ঠেলে দেয় কেঁচোর জীবনে;
ভয়ে তুমি সর্পরূপ ধরো–
বিষাক্ত ছোবল হানো নিকটজনেরে!

২.
খুব ভয় পেয়েছিলি তুই,
উড়ে যেতে চেয়েছিলি নিরাপদ আয়ুর আড়ালে
তারপর কিছুকাল জীবনকে বয়ে নিতে হলো
আহত ডানায়।

কুৎসিত ঘা সেরে গেলে শুরু হবে
আবার ভয়ের পালা–
থালাভর্তি অন্ন ফেলে কোথায় যাবি হ্যাঁ?

নতুন সড়ক

পুরনো সড়ক ভেঙে নতুন সড়ক
এই কাজে বিদেশীরা বেশ পারঙ্গম;
আমরা শুধু দৃষ্টি মেলে দিই,
সম্মোহিত হই–
মসৃণ রেখায়...

আমাদের তৃষ্ণায় বিস্তৃত
সেই রেখাদৃশ্য– ধানক্ষেত উড়ে যায়
সবুজ ডানায়; মাঝেমধ্যে
ব্রেকের কর্কশ শব্দে ফালা ফালা...দেখি
রেখার ভিতরে ক্ষেত আর
ক্ষেতের ভিতরে রেখা ঢুকে একাকার!

কি দ্রুত এগিয়ে যায় এই
মহাসড়কের প্রাণ–
মানুষে কেবলই হোঁচট খায়;
বক্তৃতা থামিয়ে
স্বামীজী হঠাৎ
মঞ্চ থেকে নেমে যান
তিনি চান সকলেই নিজের চেষ্টায় মুক্ত হোক।

বনসাঁই

প্রজাপতি, কেন এসব উৎপন্ন বস্তু
কিনছে না কেউ!
শুয়ে বসে ঋতুর ব্যথায়
কষ্ট পেয়ে ওরা সব বনসাঁই হয়ে গেল!

চাঁদের কলঙ্ক ওরা, সুতোকাটা বুড়ি;
কামধেনু তবু
রাখাল আসে না
বাজে না বাঁশরি,
নীরবতা বাড়ায় সন্ত্রাস
ওই চম্পা বকুলের ডালে!

মনে রেখো, তুমি বনসাঁইদেরও প্রভু...

কালো জ্যোৎস্না

কালের চন্দ্রিমা
দেখতে গিয়ে দেখি জঙ্গলের দিকে
শেয়ালের সাথে হেঁটে যাচ্ছে চাঁদ;
মনে পড়ে মহল্লার শ্রেষ্ঠ রূপসীর
কলঙ্ক-প্রস্থান;
এতোদিন সে ঘুমিয়ে ছিল,
হঠাৎ আবার জেগে উঠলো–
একাকীত্ব আর দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে।

পরাভূত, এ চন্দ্রিমা নয়– কালো জ্যোৎস্না
ওরই জন্যে আজ তুমি নিশি পাওয়া
ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটছো নামহীন
তোমার পিছনে ছুটে আসছে
অলৌকিক সব লোকালয়...।

পতন

ঝরে পড়া ব্যাপারটা বাতাস ও বোঁটার বিষয়
তবু ফল পেকে গেলে তাকে
অনেক সতর্ক মনে হয়
সতর্ক না হলে কে ঠেকাতে পারে নিজের পতন?

এ শহরে কতো নামী লোক ছিল, গত হয়েছেন তারা;
সে সব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হতে না হতেই
দোকান গুটিয়ে নেয় দূরের হকার।

পতনের শেষ নেই;
এ প্রসঙ্গে জীবন বড়ই তর্কপ্রবণ
যতো বলি মেনে নাও, ভুলে যাও শরের আঘাত
কে শোনে এসব?

অলীক লণ্ঠন

অলীক লণ্ঠন নিভে গেলে মাঝ পথে
স্বপ্নটা হারিয়ে যায়, জেগে জেগে ভাবতে থাকে মন :
ভয়হীন বাঁচতে চেয়েছো–
খুশি হতে– পারোনি;
ভালোবাসায় এতো সংক্রমণ!

সম্পর্কের নিচে ডুবোচর;
পূর্বস্মৃতি, পূর্ব-সম্পর্ক কারণ নয়, বাধা নয়–
ক্রোধই সব উল্টে দেয়!

প্রেমহীন ক্লান্ত ঠোঁটে চুমু খাও, কেন?

হাঁটছো জলের পরে– তোমাকে ঘিরেই
আবর্তিত অপার্থিব মাছ, পাখি– জলকানাকানি!

চিহ্নিত প্রেতাত্মা পরস্পর
ভয়াবহ বাকনিস্তব্ধতা;
হাহাকার...সাদা শীত, হলুদ পা–
ব্যথায় টন টন এ জীবন চক্র!

সভ্য সব দেবদেবী ঢুকে আছে নিজের বিবরে;
সারাক্ষণ আচ্ছন্নতা– হঠাৎ চোখে পড়ে
আত্মজা মেয়েটি রোগা, লম্বা...!

বৃষ্টি

বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে
মাটিও কামার্ত হয় তারাভরা রাতে;
নিজের ভিতর সে তখন সদা অনুভব করে
নিষিক্ত মেঘের তপ্ত সত্তা!

ভালো কথা, আসছে তবে তো মাহেন্দ্রক্ষণ–
জন্ম নেবে জলশিশু গ্রীষ্মের ঔরসে!

আবদুর রব
জন্ম ৩০ জুন ১৯৬১; খুলনা জেলার দক্ষিণের এক গ্রাম ইসলামপুরে। পৈতৃক নিবাস যশোর। বর্তমান বসবাস মোহাম্মদপুর, ঢাকায়। পেশায় অর্থনীতিবিদ। ক্ষুদ্র ও লাগসই প্রযুক্তিবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় লেখালেখির শুরু। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণ প্রাণ যাবো'। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কে ঘুমায় কে জাগে' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। অনেক চীনা কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ছোটদের জন্যেও অনুবাদ করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্প। ভ্রমণ করেছেন নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভারত, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, সাইপ্রাস, মিসর ও কেনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি দেশ। ছন্দময়তায় তরল আনন্দ ছেড়ে এই কবি বেরিয়ে এসেছেন গদ্যের ভুবনে। অনেক দিন আগে। স্বভাবত, চিন্তায় নিরীক্ষার মতো প্রবণতা ধীরে ধীরে তার কাব্যভুবনকে করেছে আচ্ছন্ন। কবিতা অনেক রকম। আবদুর রবের কবিতা এর এক অনবদ্য উদাহরণ। আশির দশকের প্রায় অপরিচিত ও নির্জন এই কবির কবিতা যেন বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ আর পরিণত চিন্তার সংমিশ্রণে জীবনকে উপলব্ধি করার এক অন্তর্দৃষ্টি। তার এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন সে কথা নিঃসন্দেহে।